ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪৩, ১৪৩২/২০২৫, ৪১-৬২
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4303

সারঙ্গধর জিউ আখড়ায় প্রাপ্ত 'নর্তেশ্বর' ভাস্কর্যে বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যের স্বরূপ সন্ধান

এগনেস র‍্যাচেল প্যারিস
সহকারী অধ্যাপক, নৃত্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract: Sculpture and dance are complementary to each other. For ages, man has practiced song, music, and dance as an integral part of society. In various art forms, the deity of dance is represented as 'Nataraja' or 'Nateshwara' (the Lord of Dance). During the Chola dynasty in South India, the 'Nataraja' sculpture was established, which is now universally recognized as the deity of the South Indian classical dance, Bharatanatyam. Almost at the same period as the Chola kings, the 'Narteshwar' or 'Nateshwara' sculpture emerged in Bengal during the Pala dynasty, proving the Bengali people's devotion to dance. However, while other classical dances of the Indian subcontinent gained recognition over time, Bengal remained silent, and as a result, the 'Narteshwara' sculpture remained behind the scenes in the world of dance. Starting from Nalinikanta Bhattasali to the contemporary researcher Anna Slakza, extensive research has been conducted on 'Narteshwara.' This paper attempts to discuss the significance and the true nature of the elements of 'Gaudiya Nritya' (the classical dance of Bengal) through the study of the 'Narteshwara' sculpture, which is dated back to the Pala-Sena period, and which is found to still be worshipped at the 'Shree Shree Sarangadhar Jiu Akhra.'

Key Words: Nateshwara, Nataraja, Gaudiya Nritya, Pala-Sena period, Chola dynasty.

ভূমিকা: বাংলার প্রাচীন যুগের শিব-নটরাজ মূর্তি কেবল ধর্মীয় বা প্রতীকমূলক নয়; বরং এটি প্রাচীন ভারতীয় শিল্প ইতিহাসের এক অনন্য অধ্যায়। ভারতীয় শিল্পকলাগুলোর মধ্যে বিশেষত নৃত্যকলায় 'নটরাজ' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। ভারতীয় উপমহাদেশে উদ্ভূত ও প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলোর প্রধান দেবতা 'নটরাজ শিব'। সম্ভবত শিবের তাণ্ডব নৃত্য থেকেই নটরাজের প্রাথমিক ধারণা উদ্ভূত হয়। পঞ্চম বেদ বলে খ্যাত ভরতের *নাট্যশাস্ত্রে* (২য় শতক সা.অব্দ) "তাণ্ডব লক্ষণ" নামক চতুর্থ অধ্যায়ে তাণ্ডব নৃত্যের উৎপত্তি প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে– শিব রেচক, পিণ্ডীবদ্ধ, করণ ও অঙ্গহার সৃষ্টি করে তণ্ডুমুণিকে প্রদান করেন এবং গীত ও বাদ্য সহযোগে তণ্ডুমুণি তাণ্ডব নৃত্য সৃষ্টি করেছিলেন। দক্ষযজ্ঞ বধের পরে সন্ধ্যাবেলায় শিব এই নৃত্য করেছিলেন।[১] দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের চোল রাজবংশের (৯ম-১৩শ সা. অব্দ) অনন্য

স্থাপত্য বৃহদ্দেশ্বর মন্দিরে নাট্যশাস্ত্রের সেই ১০৮টি ধরণের ভাস্কর্য রয়েছে। ধারণা করা হয় যে, নাট্যশাস্ত্রের দৃশ্যমান উপস্থাপনার প্রাচীনতম নিদর্শন এই ১০৮টি নৃত্যকরণ। এর সাথে উল্লেখ্য এই বৃহদ্দেশ্বর মন্দিরেই চোল শিল্পের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় চার হাতের নটরাজ মূর্তিটি রয়েছে। তবে সারদা শ্রীনিবাসন তার রচনা "Shiva as 'Cosmic Dancer': a Pallava origins for the Nataraja bronze" এ একটি নতুন চিন্তার অবতারণা করেছেন। তাঁর মতে, দক্ষিণ ভারতীয় এই ব্রোঞ্জের মূর্তি চোল রাজাদের সময়ে নয়, বরং এটি পল্লব রাজাদের (৭ম-৯ম সা. অব্দ) সময়ে নির্মিত।[২] তবে চোল বংশীয় 'নটরাজ' মূর্তিটির জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হলো আনন্দ কুমারস্বামী তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ "The dance of Siva" – যেখানে তিনি শৈব সিদ্ধান্ত আগম এর ভিত্তিতে নটরাজ শিবের আনন্দ তাণ্ডব নৃত্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অগ্নি বলয়ের মধ্যে, অপস্মার বামনের ওপর অধিষ্ঠিত এই চতুর্হস্তের নটরাজ শিবের এক হাতে থাকা অগ্নি মহাবিশ্বের ধ্বংসের প্রতীক, আর অপর হাতে থাকা ডমরু সৃষ্টির ছন্দ নির্দেশ করে। এক হাতে বরাভয় এবং নিম্নমুখী অন্য হাত 'গজহস্ত' মোহমুক্তি নির্দেশ করে। নটরাজের পদতলে থাকা স্থূল আকৃতির বামন অপস্মার অজ্ঞানতাকে চিহ্নিত করে। কুমারস্বামীর নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত গ্রন্থে এবং পরবর্তীতে ১৯৩৪ সালে হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বক্তৃতামালাভিত্তিক গ্রন্থে (*Transformation of Nature and Art*)[৩] রূপতত্ত্বের এই প্রতীকী বিশ্লেষণ শুধু আঞ্চলিক চিত্র প্রকাশ করেনি; বরং নটরাজের মহাজাগতিক রূপ বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতের প্রতীকী রূপে পর্যবসিত হয়েছে। এতদকারণে দক্ষিণ ভারতের এই মূর্তিটিই নৃত্যের আরাধ্য দেবতা 'নটরাজ'-এর একমাত্র মূর্ত রূপ বলে পরিচিতি লাভ করেছে। কিন্তু ভারতের পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলগুলো যেমন– উড়িষ্যা, বিহার এবং নেপালসহ দক্ষিণ ভারতের অমৃতঘটেশ্বর মন্দির ও ভিয়েতনামে প্রায় কাছাকাছি সময় (আনুমানিক দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে) নটরাজ ভাবনার অসংখ্য আট-বারো হাতের নন্দীষাঁড়ের ওপর নৃত্যরত নর্তেশ্বর মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে, যে মূর্তিগুলোর সাথে বিশ্ববাসীর পরিচিতি স্বল্প পরিসরে। এই অনালোচিত নটেশ্বর মূর্তিকে উল্লেখযোগ্যভাবে তুলে ধরেছেন নলিনীকান্ত ভট্টশালী তার গোড়ার দিকের কাজ *Iconography of Buddist and Brahmanical Sculptures in The Dacca Museum* গ্রন্থে। পরবর্তীতে বিভিন্ন শিল্প ইতিহাসবিদ যেমন মোখলেসুর রহমান, এ কে এম শামসুল আলম, প্রতাপাদিত্য পাল, গৌরীশ্বর ভট্টাচার্য, এনামুল হক, কল্যাণকুমার দাসগুপ্ত, সুসান হান্টিংটন প্রমুখের বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধ ও মনোগ্রাফে লক্ষ করা গেলেও এগুলোকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে লিপিবদ্ধকরণ ও অধ্যয়নের প্রচেষ্টা অতি সম্প্রতি শুরু হয়েছে।[৪] বর্তমানে আন্না স্লাকজার বাংলার নর্তেশ্বর নিয়ে গবেষণা সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণা প্রবন্ধ 'Lost and Found? A Note on Two Images of Dancing Śiva from Bangladesh' এ তিনি বাংলাদেশে দুইটি নর্তেশ্বর মূর্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন– একটি হারিয়ে যাওয়া নর্তেশ্বরের মূর্তি, যা পুনরায় নাটঘরে (ব্রাহ্মনবাড়িয়া) পাওয়া যায় এবং অন্যটি নতুন আবিষ্কৃত পুরান ঢাকার চকবাজারে অবস্থিত শ্রী শ্রী সারঙ্গধর জিউ আখড়ার বারো হাতের নর্তেশ্বর মূর্তি। আন্না এই

প্রবন্ধ লেখার সময় শ্রী শ্রী সারঙ্গধর জিউ আখড়ার দেববিগ্রহ মন্দিরের নাম সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তিনি বলেছেন,

> This short article describes one such case, of an image thought lost, but then found back in a remote village. The second image discussed here is a sculpture hitherto not mentioned in English-language publications. Its discovery demonstrates that not everything in South Asian art has been registered and studied and that we have to keep our eyes open.[5]

তবে শ্রী শ্রী সারঙ্গধর জিউ আখড়ার ঢাকার মূর্তিটির তথ্য সম্ভবত আন্না স্লাকজার পূর্ববর্তী গবেষণায় ছিল না। তিনি ২০১৫ সালে 'বেঙ্গল স্কুল অব আর্ট'-এ এই বিশেষ মূর্তির মোট সংখ্যা বলেছেন ৩৯। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে রয়েছে ২৫টি, ভারতে বাংলার বাইরে রয়েছে আরও ৭টি, নেপালে পাওয়া গেছে ৫টি এবং বিস্ময়করভাবে ৩টি নর্তেশ্বরের মূর্তি রক্ষিত আছে ভিয়েতনামে।[৬] শ্রী শ্রী সারঙ্গধর জিউ আখড়ায় রক্ষিত এই মূর্তিটি এখনো প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে বা কোনো জাদুঘরে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। বারো হাত বিশিষ্ট নর্তেশ্বরের মূর্তিটি এই মন্দিরে প্রাত্যহিকভাবে পূজা করা হয় এবং আন্না স্লাকজার পূর্বে এই মূর্তি নিয়ে কোন প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণামূলক প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়নি।

ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য শাখায় অপেক্ষাকৃত নতুন সংযোজন 'গৌড়ীয় নৃত্য'। প্রাচীন বাংলার এই ধ্রুপদী নৃত্যশৈলীর সূচনালগ্ন চিহ্নিত করা যায় ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এর সময়ে। *নাট্যশাস্ত্র*-এর চতুর্দশ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে, ভারতীয় উপমহাদেশে চার ধরনের 'বৃত্তি' বা 'স্টাইলের' নাট্য তথা নৃত্য চর্চা করা হতো– দাক্ষিণাত্য, পাঞ্চালি, অবন্তী ও ঔড্রমাগধী।

> "অঙ্গা বঙ্গা উৎকলিঙ্গা বৎসাশ্চৈবৌড্রমাগধাঃ।
> পৌণ্ড্রা নেপালকাশ্চৈব অন্তর্গিরিবহির্গিরাঃ।।
> তথা প্রবঙ্গমাহেন্দ্রমলদামল্লবর্তকাঃ।
> ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতয়ো ভার্গবা মার্গবাস্তথা।।
> প্রাগ্‌জ্যোতিষাঃ পুলিন্দাশ্চ বৈদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
> প্রাঙ্গপ্রভৃতয়শ্চৈব যুঞ্জন্তি চৌড্রমাগধীম্।।"[৭]

অর্থাৎ, অঙ্গ (বর্তমান মুঙ্গের), বঙ্গ (দক্ষিণ বাংলা), উৎকলিঙ্গ (উৎকল বা ওড়িশা), পৌণ্ড্র (উত্তরবঙ্গ), নেপাল, অন্তর্গিরি- বহির্গিরি (বিহার), প্রবঙ্গ (পূর্ববঙ্গ), মলদা (মালদা জেলা), মল্লবর্তকা (বাঁকুড়া জেলার মল্লভূম অর্থাৎ পুরুলিয়া) ব্রাহ্মোত্তর, ভার্গবা-মার্গবা (অজানা), প্রাগজ্যোতিষ (আসাম), তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি নামগুলো বর্তমান বাংলাদেশ, নেপাল ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, বিহার, আসাম অঞ্চলসমূহকে ইঙ্গিত করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, এতদ বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ওড্রমাগধী নৃত্যধারার প্রচলন ছিল। *মতঙ্গের বৃহদ্দেশী*, *কলহণের রাজতরঙ্গিনী*, *তারা ও মঞ্জুশ্রীস্তোত্র*, *চর্যাপদ*, *নাথ সাহিত্য থেকে শুরু করে গীতগোবিন্দ*, *মঙ্গলকাব্য*, *বৈষ্ণব সাহিত্য* পর্যন্ত এই সুবিশাল সাহিত্যের ইতিহাসে বাংলায় চর্চিত নৃত্যের ধরন, নট বা নটী, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে নৃত্যের অবতারণা বলে দেয় প্রাত্যহিক জীবনে বাঙালির নৃত্যপরায়ণতার কথা। বাংলা ভাষাভাষী অধ্যুষিত অঞ্চলে নৃত্যের নজির শুধু সাহিত্যে প্রতিভাত হয়নি বরং স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্র,

পুথিমালা, শিলালিপি, তাম্রলিপি ইত্যাদিতেও এর প্রতিফলন প্রবলভাবে দৃশ্যমান। মঠ-মন্দির, বিহার-মহাবিহারে ভাস্কর্যশিল্প চর্চার যে প্রচলন ছিল, তা বর্তমান জাদুঘরে রক্ষিত মূর্তিগুলো দেখলেই অনুধাবন করা যায়। তবে কালের অমোঘ নিয়মে তার প্রায় অধিকাংশই অবলুপ্তির পথে রয়েছে। বিংশ শতকের শেষের দিকে মহুয়া মুখোপাধ্যায়ের বিস্তৃত গবেষণার মধ্য দিয়ে এই বিলুপ্তপ্রায় নৃত্যধারার পুনর্জাগরণ ঘটে। সারাবিশ্ব যখন আনন্দকুমার স্বামীর কল্যাণে দক্ষিণ ভারতের অপস্মার বামনের ওপর নৃত্যরত 'নটরাজ' কে নিয়ে ব্যস্ত, সেই সময় মহুয়া মুখোপাধ্যায় বাংলার 'নর্তেশ্বর'কে প্রকাশিত করলেন নৃত্যের আঙ্গিকে। পাল-সেন যুগের 'নর্তেশ্বর' এবং চোল যুগের 'নটরাজ' প্রায় সমসাময়িক। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালীন সময়ে প্রাচীন বাংলা ও দক্ষিণ ভারতে নৃত্য ব্যাপকভাবে চর্চিত হতো। এই পরিপ্রেক্ষিতে কতগুলো প্রশ্নের উদয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক। যদি এভাবে বলা যায়–

(ক) এ অঞ্চলে নির্মিত ভাস্কর্যে গৌড়ীয় নৃত্যের প্রভাব কতটা ছিল?
(খ) 'নর্তেশ্বর' কি বাংলার নৃত্যের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে?
(গ) বর্তমান বিশ্বে 'নর্তেশ্বর' নিয়ে বহু ইতিহাসবিদ, প্রত্নতাত্ত্বিক ভাস্কর্য বা মূর্তি গবেষণা নিয়ে স্বীয় ক্ষেত্রে কাজ করেছেন। কিন্তু নৃত্যের আঙ্গিকে গবেষণা কতটুকু হয়েছে?
(ঘ) নৃত্যে নর্তেশ্বরের ভূমিকা নিয়ে মহুয়া মুখোপাধ্যায় গভীর ও বিস্তৃত কাজ করেছেন। তার উত্তরসূরিরাও নর্তেশ্বর নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। এ সকল গবেষণা নতুন কোনো ধারণা আবিষ্কার করতে পেরেছে কি?
(ঙ) গৌড়ীয় নৃত্যের ক্ষেত্রে শ্রী শ্রী সারঙ্গধর জিউ আখড়ার 'নর্তেশ্বর' কি নতুন ভূমিকা রাখতে পারবে?

অধুনা আবিষ্কৃত শ্রী শ্রী সারঙ্গধর জিউ আখড়ায় ক্ষেত্র সমীক্ষা করে, সেখানে অবস্থিত 'নর্তেশ্বর' মূর্তিতে নৃত্যের শাস্ত্রীয় উপকরণ পর্যালোচনার মাধ্যমে গৌড়ীয় রীতির স্বরূপ ও এই মূর্তির বিশ্লেষণই প্রবন্ধটি রচনার মূল উদ্দেশ্য।

বাংলার ভাস্কর্য রীতি: প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগের প্রারম্ভকাল (১২০০ সা.অব্দ) পর্যন্ত বাংলা তথা ভারতের পূর্বাঞ্চল একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের সাক্ষ্য বহন করে। সময়ের ধারাবাহিকতায় বাংলার রাজনীতি, সমাজ এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে এক নব অধ্যায়ের সূচনা ঘটায়। ইতিহাসবিদদের মতে, আনুমানিক ৭৫০ থেকে ১২০০ সা.অব্দ পর্যন্ত সময়কালকে বাংলার পাল ও সেন যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। পাল শাসনের পূর্বে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অস্থিতিশীল। রাজা গোপাল পাল বংশের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলায় এক নব দিগন্ত উন্মোচিত হলো। পাল রাজাদের সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম, বিশেষ করে মহাযান ও বজ্রযান ধারার বিস্তার ঘটে। নালন্দা, বিক্রমশীলা, সোমপুর, জগদ্দল প্রভৃতি মহাবিহার গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও শিল্পকেন্দ্র হিসেবে। বৌদ্ধ শিল্প, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যে বাংলার নিজস্ব ধারা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, যা পরবর্তীকালে ভারতীয় শিল্পরীতিতে গভীর প্রভাব ফেলে। পাল যুগের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বাংলা সংস্কৃতির বিকাশে বিশেষ অবদান রাখে। এই সময়ের ভাস্কর্য, মুদ্রা, শিলালিপি এবং প্রত্ননিদর্শনে বাংলার শিল্প ও সংস্কৃতির এক সোনালি অধ্যায় প্রতিফলিত হয়। তবে বাংলায় ঠিক কোন সময় থেকে

প্রস্তর নির্মিত ভাস্কর্যের প্রচলন শুরু হয়েছে তার সুনির্দিষ্টকাল নির্ণয় দুঃসাধ্য। অশোক কে. ভট্টাচার্যের মতে, এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত আদি প্রস্তর ভাস্কর্য বাংলায় সা. অব্দের প্রথম তিন শতকের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। সেগুলো সংখ্যায় কম এবং এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য, এরা মথুরা রীতির অন্তর্গত এবং মূলত তিনটি ধর্ম– ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অনুসারীগণ পূজার উদ্দেশ্যে এই মূর্তি নির্মাণ শুরু হয়েছিল। এই প্রস্তর শিল্পের মূল বিকাশ ঘটে পাল-সেন যুগে। ৪০০ বছরেরও অধিক সময় ধরে এই শিল্পটি বিকাশ লাভ করে। এই সময়ের প্রস্তর ভাস্কর্যের শিল্পরীতি তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী 'পাল-সেন স্কুল' নামে পরিচিতি লাভ করে।[৮] মূর্তিতাত্ত্বিক নিয়মতান্ত্রিকতার মাঝেও রূপদক্ষগণের নিজস্ব প্রতিভা 'পাল-সেন স্কুলের' ভাস্কর্যে আজও সাক্ষ্য বহন করছে। সতেরো শতকে ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মের তিব্বতি ঐতিহাসিক লামা তারানাথ তার গ্রন্থ *Tāranātha's History of Buddhism in India*-এ উল্লেখ করেছেন যে, ধীমান ও তার পুত্র বীতপাল অত্যন্ত সুদক্ষ রূপদক্ষ ছিলেন। আট শতকের শেষ ও নয় শতকের প্রথমদিকে তাঁদের দ্বারা ধ্রুপদি নাগরীতি বৈশিষ্ট্যের 'গুপ্ত ধ্রুপদি' শিল্পের বিকাশ লাভ করে।[৯] তবে, 'পাল-সেন স্কুলের' এই ভাস্কর্যগুলির 'বঙ্গ রীতি' নামকরণ করে জিনাহ্ কিম কয়েকটি যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন। এই রীতির ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ ভাস্কর্যগুলো বঙ্গীয় স্বাতন্ত্র্য নিয়ে তিনি কোনো সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাননি। তবে অঞ্চলভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে একে 'বঙ্গ রীতি' বলে বিবেচনাযোগ্য বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে, 'বঙ্গাল' শব্দটি এসেছে সম্ভবত ইংরেজি 'বেঙ্গল' নামের উৎস 'বঙ্গ' থেকে। 'বঙ্গ' নামক জনপদে চন্দ্র, বর্মা ও সেন রাজাদের রাজধানী ছিল প্রাচীন বিক্রমপুর, যা এখনকার মুন্সীগঞ্জ জেলার রামপাল অর্থাৎ ঢাকা শহরের নিকটবর্তী মুন্সীগঞ্জ ও আশেপাশের এলাকায় একাদশ ও দ্বাদশ শতকে রাজনৈতিক উত্থানের সাথে সম্পৃক্ত। এই যুক্তির সমর্থনে কিম এই এতৎঞ্চলের বাংলার ভাস্কর্যরীতিকে 'বঙ্গ রীতি' বলে বিবেচনা সাপেক্ষ বলে মনে করেন।[১০]

চিত্র-১: চিদাম্বরম মন্দিরে রক্ষিত নটরাজ মূর্তি (ছবি- https://www.holydham.com/chidambaram-the-temple-of-dancing-shiva/

বাংলার নর্তেশ্বর: 'নর্তেশ্বর' নিয়ে আলোচনার পূর্বে দক্ষিণ ভারতীয় 'নটরাজ' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতির প্রয়োজন। আনন্দকুমার স্বামী তাঁর গ্রন্থ *Dance of Shiva* এ নটরাজ সম্পর্কে বলেছেন, "সমগ্র বিশ্বজগৎ তাঁর নাট্যমঞ্চ; সেখানে তাঁর নৃত্যভাণ্ডারে বহু

ভিন্ন ভিন্ন নৃত্যভঙ্গি রয়েছে। তিনি নিজেই অভিনয়কারী এবং নিজেই দর্শক"।[১১] তাঁর মতে, নটরাজ শিবের আনন্দতাণ্ডবরূপ, অর্থাৎ সৃষ্টি ও সংহারের মহাজাগতিক নৃত্য যা অহং বিনাশের পরমানন্দের প্রকাশ। তাঞ্জোরের চিদাম্বরমের নটরাজ মূর্তিটি তিন ফুট উচ্চতার ব্রোঞ্জের তৈরি। চতুর্ভুজের নটরাজের মূর্তিতে প্রকাশিত হয় শিবের পাঁচটি প্রধান কর্ম বা পঞ্চকৃত্য- ১) সৃষ্টি- ডানদিকের পেছনের হাতে ধ্বনিত ডমরু দ্বারা, ২) সংরক্ষণ/রক্ষা– ডানদিকের সামনের হাতে, ৩) অজ্ঞতা ও অহং বিনাশ– বাম পায়ের নিচে অপস্মার বা মুলয়গন অসুরকে পদদলিত করে, ৪) অনুগ্রহ/শান্তি প্রদান- সামনের বাম হাত, ৫) বামদিকের পেছনের হাতে অগ্নিশিখা ধরা।[১২] চিত্র-১ এ, গোলাকৃতির একটি অগ্নিবলয়ের মাঝখানে নটরাজ শিব দাঁড়িয়ে আছেন। যেখানে ডান পা শরীরের সামনে ক্রস করে আছে যা ১০৮টি করণের একটি করণ 'ভূজঙ্গত্রাসিত করণের' ন্যায়। আরেকটি পা অর্ধমণ্ডল স্থানকে অপস্মার পুরুষকে দমন করে আছে। পেছনের ডান হাত উন্মুক্ত সিংহমুখ হস্তে ডমরু ধরে আছে।

বাম হাতটি অলপদ্ম দিয়ে অগ্নিশিখা বোঝাচ্ছে। সামনের ডান হাত বরাভয় মুদ্রা আর বাম হাত ক্রস করে প্রসারিত করে 'গজহস্ত' নৃত্তহস্ত মুদ্রা ধরে আছে। এই চিত্রের নটরাজ মূর্তিটি তামিলনাড়ু রাজ্যের তাঞ্জোরের চিদাম্বরম মন্দিরে রক্ষিত আছে। এই মূর্তিটির পৌরাণিক আখ্যান বারো শতকের একটি সংস্কৃত গ্রন্থ *চিদম্বর মাহাত্ম্য* থেকে নেওয়া হয়েছে। পরে এর তামিল সংস্করণ রচিত হয় *কোয়িল পুরাণম* এ।[১৩] মূর্তিতে ভাস্বর শিব এর আখ্যান তামিল সাহিত্য থেকে উৎসারিত এবং এর নির্মাণশৈলী দক্ষিণ ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে।

দক্ষিণ ভারতীয় নটরাজের মূর্তিটির নৃত্যভঙ্গিমা 'আনন্দ তাণ্ডব', আর এদিকে বাংলার নর্তেশ্বরের নৃত্যভঙ্গিমা 'ললিত আনন্দ তাণ্ডব' পাল ও সেন যুগের বঙ্গ রীতির নর্তেশ্বরের মূর্তি ইতিহাসবিদদের সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রাচীন রামপাল নামক একটি গ্রামে অনেক নর্তেশ্বরের মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল এবং সেই গ্রামটি আজও 'নটেশ্বর' বলে পরিচিত; ত্রিপুরা জেলার 'নাটঘর' গ্রামে আজও নর্তেশ্বর পূজিত হয়, যা নলিনীকান্ত ভট্টশালীর কাছে চমকপ্রদ বলে মনে হয়েছে। তাঁর মতে, পাল-সেন যুগের প্রাপ্ত বাংলার নর্তেশ্বর মূর্তি সাধারণত দুই শ্রেণির হয়ে থাকে।[১৪] এক শ্রেণির নর্তেশ্বরের দশ হাত এবং যিনি তলোয়ার ধরে আছেন। এ ধরনের নর্তেশ্বরের উল্লেখ *মৎস্যপুরাণ*-এ পাওয়া যায়। আর অন্য শ্রেণির, বারো হাত বিশিষ্ট নর্তেশ্বর, যিনি সামনের দু'হাতে বীণা ধরে আছেন এবং শেষ দুই হাত দিয়ে মাথার ওপর ছাতার মতো 'শেষানাগা' ধরে আছেন। জটার ওপর হাত দুটি 'অঞ্জলি হস্তে' ধরে যেন মনে হচ্ছে তিনি তালি দিয়ে নৃত্যের সাথে তাল রক্ষা করছেন। তবে অল্পসংখ্যক আট হাত বিশিষ্ট নর্তেশ্বরের মূর্তিও পাওয়া গিয়েছে এই অঞ্চলে। আন্না স্লাকজা তার প্রবন্ধ 'Dancing Siva Images from Bengal' এ ভট্টশালীর সাথে সংগতি প্রকাশ করে বলেছেন বাংলায় প্রাপ্ত নর্তেশ্বর মূলত দু'ধরনের, দশ হাত বিশিষ্ট ও বারো হাত বিশিষ্ট।[১৫] আর কিছু আট হাত বিশিষ্ট নর্তেশ্বরের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে। তবে সর্বাধিক দশ ও বারো হাত বিশিষ্ট নর্তেশ্বর ঢাকা ও তার আশেপাশের অঞ্চল থেকে পাওয়া গিয়েছে। এই ধরনের সকল মূর্তিই কালোপাথর বা কষ্টিপাথরের তৈরি। পলিমাটির বাংলায় পাথরের মূর্তির প্রাবল্যের কারণ সম্ভবত ভাগীরথী নদী দিয়ে নৌকায় করে বিহারের রাজমহল থেকে নিয়ে আসা হতো

ব্ল্যাক ব্যাসল্ট পাথর, যা দিয়ে এই মূর্তিগুলো নির্মিত। তবে, ব্রোঞ্জের তৈরি নর্তেশ্বরের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে তামিলনাড়ু রাজ্যের চিদাম্বরম মন্দিরের পাশে মেলাক্কাডম্বুরের অমৃতঘটেশ্বর মন্দিরে। দ্বাদশ শতকে রাজেন্দ্র চোল গঙ্গাইকোণ্ডা বাংলা (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে দক্ষিণ ভারতে নিয়ে গিয়ে অমৃতঘটেশ্বর মন্দিরে ব্রোঞ্জের এই মূর্তিটির বিগ্রহ স্থাপন করেন।[১৬] *মৎস্যপুরাণ*-এর ২৫৯নং অধ্যায়ে রুদ্র তথা নর্তেশ্বরের রূপ কেমন হবে তার বর্ণনা দেওয়া আছে। সেখানে বলা হয়েছে, রুদ্রের তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় তার শরীর প্রভাবিত হবে, মাথার জটাজুট শুভ্র অর্করশ্মির মতো হবে এবং চন্দ্রাঙ্কিত হবে, তিনি জটামুকুটধারী হবেন এবং তার দেহবল্লভ হবে ষোড়শ বর্ষীয় যুবকের ন্যায়। সুডৌল ঊরু-জঙ্ঘা, হন্তা-হন্তীর ন্যায় বাহুদ্বয়, সুবিশাল আয়তনেত্র, ব্যাঘ্রচর্ম, সূত্রত্রয় দ্বারা আবৃত। কানে কেয়র, বক্ষে বিলম্বিত হার, ভূষণ হবে ভুজঙ্গগণ। তিনি ধারণ করবেন সৌম্যমূর্তি। তার বাম হাতে থাকবে খেট্ব ও দক্ষিণ হাতে থাকবে খড়্গ। একইদিকের হাতগুলোতে শক্তি, দণ্ড ও ত্রিশূল বিন্যাসিত থাকবে এবং বামদিকের হস্তগুলোতে কপাল, নাগ এবং খট্বাঙ্গ থাকবে। তিনি যখন বৃষভের ওপর নৃত্য করতে থাকবেন তখন একহাতে বরাভয় আর অন্যহাতে বলয় থাকবে। তিনি যখন নৃত্য করবেন তখন তার গজচর্মযুক্ত দশভুজ জানবে।[১৭]

চিত্র-২: মুন্সিগঞ্জের শঙ্করাবন্ধে প্রাপ্ত নর্তেশ্বর মূর্তি
(ছবি - Nalini Kanta Bhattasali, *Brahmanical Sculptures: Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum*, 111)

এনামুল হকের ভাষায়, বাংলার নটরাজ মূর্তিগুলো একেবারেই মৌলিক ও স্বতন্ত্র একটি ধারা তৈরি করেছে। দক্ষিণ ভারতের প্রচলিত নটরাজ রূপ বিশেষ করে ব্রোঞ্জের মূর্তিগুলোতে দেবতা অপস্মার পুরুষের পিঠে নৃত্যরত অবস্থায় চিত্রিত হন। কিন্তু বাংলার নটরাজ, পাথর বা ধাতু যে মাধ্যমেই হোক এই দক্ষিণ ভারতীয় ধরণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। নটরাজ রূপটি, যা সাধারণত ব্রোঞ্জে নির্মিত এবং অধিকাংশ সময় দশভুজ বা দ্বাদশভুজ রূপে পাওয়া যায়, সর্বদাই বৃষের পিঠে নৃত্যরত অবস্থায় চিত্রিত হয়েছে। ভরেল্লা থেকে প্রাপ্ত মূর্তিটির আসনলিপিতে দেবতার নাম 'নটেশ্বর' বলে উল্লেখ রয়েছে।[১৮]

চিত্র ২-এ যে নর্তেশ্বরের মূর্তিটি দেখা যাচ্ছে, এটি ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জের কাছে রামপালের শঙ্করাবন্ধে পাওয়া গেছে। ব্ল্যাক ব্যাসল্ট দিয়ে তৈরি দশ হাতের এই নর্তেশ্বরের মূর্তিটি। নন্দী ষাঁড়ের ওপর দাঁড়িয়ে নৃত্যরত শিব। বামহাত প্রসারিত করে গজহস্ত ধরে আছে, ডান হাতে খড়্গ ধৃত। ডানদিকের বাকি চারটি হাত

দিয়ে বর্শা, দণ্ড, ত্রিশূল ও বরাভয় মুদ্রা ধরে আছে। অন্যদিকের বাম হাতের বাকি ৪টি হাত দিয়ে ঢাল, কপাল বা মাথার খুলির পাত্র, নাগ-পাশ, জপমালা ও খট্বাঙ্গ ধরে আছে। নানা ভূষণে আবৃত দেহ। নন্দীষাঁড় অত্যন্ত আনন্দের সাথে শিবের দিকে তাকিয়ে আছে। এছাড়া শিলাপট্টের ওপরের খণ্ডে গণেশ, ব্রহ্মা, বুদ্ধ, বিষ্ণু, নৃত্যভৈরব ও আর দুপাশে পুষ্পমালা হাতে বিদ্যাধর রয়েছে। আর নিচের খণ্ডে দু'পাশে গঙ্গা-গৌরীর উপস্থিত লক্ষ করা যায়। এছাড়া নিচের পাদপীঠে বা প্যাডেস্টালে বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নৃত্যরত গণদের দেখা যাচ্ছে। শিলাপ্রস্তরের এই দশবাহুর সাথে মৎস পুরাণে বর্ণিত নর্তেশ্বরের সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

চিত্র ৩-এ তামিলনাড়ু রাজ্যের তাঞ্জাবুর জেলার চিদাম্বরমের পাশে মেলাক্কাডম্বুরে অমৃতঘটেশ্বর মন্দিরে এই ব্রোঞ্জের মূর্তিটি রক্ষিত আছে। সম্ভবত এই মূর্তিটির উৎস ঢাকা বা কুমিল্লা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা। দ্বাদশ শতকের চোল রাজবংশের রাজা রাজেন্দ্র চোল গঙ্গাইকোণ্ডে গাঙ্গেয় অঞ্চলে বঙ্গ বিজয়ের পর দক্ষিণে ফিরে যাওয়ার সময় এই মূর্তিটি নিয়ে গিয়ে অমৃতঘটেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত করেন বলে প্রচলিত আছে। এখানে উল্লেখ্য যে, তৎকালে বাংলা মন্দিরের একজন প্রভাবশালী আচার্যকে এই বিজয়ী দলের সাথে দক্ষিণে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যিনি গৌড়-দেশ থেকে আগত আচার্য নামে পরিচিত ছিলেন।[১৯] এই মূর্তিটিতেও বাম পার্শ্বে গজহস্ত, খড়্গ, খেটক, কপাল বাহু প্রসারিত করে ধারণ করে আছে। আর একইভাবে বাহু প্রসারিত করে দক্ষিণ হাতে ধরে রয়েছে– ত্রিশূল, দণ্ড, নাগ-পাশা, শক্তি,খট্বাঙ্গ। এটি সম্পূর্ণভাবে ব্রোঞ্জের তৈরি হওয়ায় এতে শিলাপট্টের ওপর যে চরিত্রগুলো সাধারণত থাকে সেগুলো এই মূর্তিটিতে দেখা যাচ্ছে না, যেমন– এতে বিদ্যাধর নেই। নিচের প্যাডেস্টেল দুই ভাগে বিভক্ত। তাতে ওপরের ভাগে গণেশ, নৃত্যভৈরব রয়েছে, কিন্তু গঙ্গা ও গৌরীর উপস্থিতি নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। আর নিচের ভাগে ব্রহ্মার উপস্থিতি বোঝা যাচ্ছে এবং সেই সাথে নৃত্যরত গণদের দেখা যাচ্ছে। মুন্সীগঞ্জে প্রাপ্ত শিলাপ্রস্তরের সাথে ব্রোঞ্জের নর্তেশ্বরের সাদৃশ্যই বেশি। তবে আনুষঙ্গিক চরিত্রগুলোতে পার্থক্য রয়েছে।

চিত্র-৩: অমৃতঘটেশ্বর মন্দিরে রক্ষিত নর্তেশ্বর মূর্তি
(ছবি - Anna A. Ślączka, *Dancing Siva Images from Bengal*, 147)

চিত্র-৪: ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটিতে রক্ষিত নর্তেশ্বর মূর্তি। (ছবি– জন সি হান্টিংটন)

সাধারণভাবে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, দশ হাতের নর্তেশ্বর থেকে বারো হাতের নর্তেশ্বর সামগ্রিকভাবে ভিন্ন। চিত্র ৪-এ দেখা যাচ্ছে বারো হাতের নর্তেশ্বর মূর্তি তুলনামূলকভাবে অধিক অলংকৃত। এই নর্তেশ্বরের উল্লেখযোগ্য দিকগুলি হলো- প্রথমত, এটি ঊর্ধ্বলিঙ্গ, বক্ষের সামনের দুহাতে বীণা ধরে আছে। দ্বিতীয়ত, জটার ওপর দুহাতে অঞ্জলিহস্ত ধরে আছে এবং তৃতীয়ত, সবার ওপরে দুহাত প্রসারিত করে পৌরাণিক চরিত্রের 'নাগালোক' ধরে আছে। অঞ্জলি হস্তের মাধ্যমে তালি দিয়ে তাল রক্ষার মাধ্যমে সময় ধারণ করছে বলে ভট্টশালী উল্লেখ করছেন।[২০] তবে শাস্ত্রানুযায়ী বিশেষত *নাট্যশাস্ত্র*-এর সংযুক্ত হস্তভেদের 'অঞ্জলি'হস্ত মুদ্রার মতো দুহাত করজোড় করা নেই; বরং এখানে দেখতে পাওয়া যায় দুহাতের অঙ্গুলিসমূহ একে অপরের মাঝ দিয়ে 'ক্রস' চিহ্নের মতো দেখাচ্ছে যা, *নাট্যশাস্ত্র* মতে, সংযুক্ত হস্তভেদের 'কর্কটহস্তের' ন্যায়। একথা এনামুল হক স্বীকার করেছেন। এছাড়া বামদিকের হাতগুলোতে কমণ্ডুলু, ত্রিশূল ও দোল হস্ত দেখা যাচ্ছে। আর অন্যদিকের হাতগুলোতে বরাভয় হস্ত, কপাল, জপমালা ধরে আছে। শিলাপট্টের ওপরে গণেশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও নৃত্যভৈরবের সাথে কীর্তিমুখ দেখা যায়। দু'পাশে গঙ্গা ও গৌরী, তাদের বাহন– শুশুক ও সিংহ রয়েছে। নিচে নৃত্যরত গণদের দেখা যাচ্ছে। বীণাধারী নর্তেশ্বর উৎফুল্ল নন্দীষাঁড়ের ওপর নৃত্যরত রয়েছেন। এই নর্তেশ্বরের নৃত্যকে ভট্টশালী 'সন্ধ্যা তাণ্ডব' বলে অবহিত করেছেন।

এ সকল মূর্তি পর্যালোচনায় বোঝা যায় যে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রাপ্ত এই নর্তেশ্বর মূর্তিগুলোর মধ্যে আঙ্গিক পার্থক্য খুব বেশি নেই।

শ্রী শ্রী সারঙ্গধর জিউ আখড়ায় প্রাপ্ত নর্তেশ্বর: এই প্রবন্ধের মূল বিষয় পুরান ঢাকাস্থ চকবাজারের শ্রী শ্রী সারঙ্গধর জিউ আখড়ায় প্রাপ্ত একটি নর্তেশ্বর মূর্তি যা পাওয়া যায় ২০১১ সাল নাগাদ। এই মূর্তিটি উদ্ধার করেন ঢাকার একটি আর্কিটেকচারাল ডকুমেন্টেশন কমিটি। ২০১১ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে বিভিন্ন ধরেনের সার্ভে হবার পরও তখন পর্যন্ত বহির্বিশ্বে এর কোনো প্রকাশ হয়নি। ২০১৯ সালে 'Netherlands Rijksmuseum' এর South Asian Art এর কিউরেটর আন্না স্লাকজা বলেন, 'It is fascinating that one can still 'discover' images that are not known to scholars|'[২১] শ্রী শ্রী সারঙ্গধর জিউ আখড়ায় এই মূর্তিটিকে এখনো প্রাত্যহিক পূজা করা হয়। এই মূর্তি কবে এবং কীভাবে এই মন্দিরে এসেছে তার কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। মন্দিরের প্রধান আচার্য শ্রী জগদীশ আচারীর দেওয়া সাক্ষাৎকারের তথ্য অনুযায়ী এই মন্দিরটি শ্রী কমিটির রামানুজ সম্প্রদায়ের এবং এমন ছয়টি মন্দির আছে বাংলাদেশে। তার মধ্যে প্রাচীনতম পুরান ঢাকার চকবাজারের এই মন্দিরটি। এটি রামভক্ত মন্দির এবং এখানে প্রতিদিন রামের পূজার পাশাপাশি নর্তেশ্বরের পূজা করা হয়। ১৯৪৭ সা.অব্দের আগে শ্রী শ্যামদাস আচারী এই মন্দিরের প্রধান আচারী ছিলেন। বর্তমান প্রধান আচারীর ধারণা অনুযায়ী প্রায় ৫০০ বছর আগে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ১৯৪৭-এর দেশভাগের আগেই এই মূর্তিটি এই মন্দিরের বিগ্রহ হিসেবে পূজিত হয়ে এসেছে। প্রাত্যহিক পূজার দেবতা বলে মূর্তিটি এই মন্দির থেকে অপসারিত হলে ভক্তকুলের অমঙ্গল হবার ভয়ে মন্দির কর্তৃপক্ষ নর্তেশ্বরের মূর্তিটি কোনো জাদুঘরে স্থাপন করতে অনাগ্রহ প্রকাশ করেছেন, যার ফলে এর কোনো রেজিস্ট্রেশন নম্বর নেই।[২২]

চিত্র ৫: নটেশ্বর, শ্রী শ্রী সারঙ্গধর জিউ আখড়া, চকবাজার, ঢাকা (ছবি - লেখক)

নর্তেশ্বরের পরিচিতি: চিত্র ৫-এ প্যাডেস্টাল বা পাদপীঠসহ সমগ্র মূর্তিটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫ ফুট। শুধু নর্তেশ্বরের মূর্তিটি উচ্চতায় ৩ ফুট এবং প্রস্থে ১ ফুট ১০ ইঞ্চি। বারো হাতের এই মূর্তিটি *মৎস্যপুরাণ*-এর বর্ণনা অনুযায়ী নির্মিত। অত্যন্ত কারুকার্য খচিত এই মূর্তিটি নন্দীষাঁড়ের ওপর অতিভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। ঊর্ধ্বলিঙ্গের এই মূর্তির বক্ষের সামনে ধৃত

বীণা প্রায় ১ ফুট ৫ ইঞ্চির। জটার ওপর দু'হাত দিয়ে কর্কট হস্ত ধরে আছে। মাথার ওপর নাগালক ধরে আছে। ডান হাতে ধরে আছে– কমণ্ডুলু, ত্রিশূল, কপাল এবং বিপরীত পাশের হাতগুলোতে বরাভয়, ডমরু, জপমালা দেখতে পাওয়া যায়। দুজন পুষ্পমালা হাতে বিদ্যাধর রয়েছে। গণেশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও নৃত্যভৈরবের মাঝে মাথাবিহীন একটি বৃষভ। সাধারণত এইস্থানে কীর্তিমুখ থাকে, তার বদলে এই বৃষ রয়েছে। নিচের দুপাশে শিবের দুই স্ত্রী 'গঙ্গা' ও 'গৌরী'। গঙ্গার ঠিক ওপরে দেবী সদৃশ একটি চরিত্র দেখতে পাওয়া যায়, সম্ভবত 'চামুণ্ডা' দেবীকে দেখানো হয়েছে। চিত্র ৩-এর বারোহাতের মূর্তিটিতে বৃষভ ও এই চামুণ্ডাকে দেখা যায় না। প্যাডেস্টালে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নৃত্যরত গণদের দেখা যাচ্ছে।

গৌড়ীয় নৃত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ: বাঙালির কোনো শাস্ত্রীয় নৃত্য নেই, এই সাধারণীকৃত ধারণা বা বিশ্বাস ভঙ্গ করে বিংশ শতকের শেষপাদে বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্য পুনরুদ্ধার করেন মহুয়া মুখোপাধ্যায়। ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলোর ইতিহাস, ক্রমবিবর্তনের সূত্র অনুসন্ধান করে মহুয়া মুখোপাধ্যায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বাংলার নিজস্ব শাস্ত্রসম্মত নৃত্যধারা রয়েছে।[২৩] প্রাচীন এই নৃত্যশৈলী বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি ইতিহাস হতে মূল চারটি উপাদান বেছে নিয়েছেন– ১) সাহিত্য ও ইতিহাস, ২) সংগীত শাস্ত্র, ৩) স্থাপত্য, ভাস্কর্য, লেখমালা ও চিত্রশিল্প, ৪) গুরুমুখি লোকায়ত নৃত্যধারা।[২৪]

১) সাহিত্য ও ইতিহাস: গৌড়ীয় নৃত্যের ইতিহাস সন্ধানে সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যই প্রধান উপজীব্য বিষয়। পাল-পূর্ব যুগে সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞদের গ্রন্থে সর্বাধিক প্রাচীন নিদর্শন মেলে। উদাহরণস্বরূপ ভরতমুণির *নাট্যশাস্ত্র* (২য় সা.অব্দ) চন্দ্রগোমিণের *তারা ও মঞ্জুশ্রীস্তোত্র* (৫ম সা.অব্দ), মতঙ্গের *বৃহদ্দেশী* (কারো মতে, ৫ম সা.অব্দ, আবার কারো মতে ৭ম-৮ম সা.অব্দ)। বাৎস্যায়নের *কামসূত্র*-এ গৌড়দেশবাসিনী নারীদের বর্ণনা, কলহনের *রাজতরঙ্গিনী*-এ দেবদাসী কমলার নাট্যশাস্ত্রানুসারে লাস্যাঙ্গ নৃত্য ইত্যাদি গ্রন্থে পাল-পূর্ব যুগের সাহিত্যে এই অঞ্চলের সংগীতের তিনটি শাখা– গীত, বাদ্য, নৃত্যের ও নট-নটীর কথা উল্লেখ করা আছে। পালযুগ তথা বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন-চর্যাপদ ও নাথসাহিত্যে বৌদ্ধসাধকদের সাধনসংগীত ও ডোম-ডোমিনীদের নাট্যাভিনয়ের কথা জানা যায়। যেমন– "এক সো পাদুমা চৌষঠ্ঠী পাখুড়ী, তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।।"[২৫] সেনযুগের কবি জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* নৃত্যগীতের আকরগ্রন্থ। সেনযুগের পরে সাহিত্য রচনা স্থবির ছিল, কিন্তু গ্রামীণ লোকায়াত ধারায় নৃত্যের চর্চা সুপ্ত আকারে রয়ে গিয়েছিল। এসময় ঝুমুর, পাঁচালি, ধামালি, কথকতা, জাগ-গান, গম্ভীরা ইত্যাদি লোকায়ত বংশপরম্পরা ধারার নাট-গীতগুলো চর্চিত হত বিভিন্ন আসরে, নাটমণ্ডপে। চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগ অর্থাৎ পঞ্চদশ শতকে যে নাম বিশেষ ভূমিকা রাখে তা হল বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* ও মালাধর বসুর *শ্রীকৃষ্ণবিজয়*। এদিকে বাংলা লৌকিক সাহিত্যের অনন্য শাখা মঙ্গলকাব্য এমনই নৃত্য-গীতের এক রত্নভান্ডার যেখানে গৃহস্থ বাঙালির উঠোন থেকে স্বর্গের দেবতাদের সামনে বাংলার গৃহবধূ 'বেহুলার' নৃত্য পরিবেশনের কথা জানা যায়। শুধু তাই নয়, বাঙালি নারীর আহার্য অভিনয়ও সুন্দর করে বর্ণিত আছে। প্রায় কাছাকাছি সময় পঞ্চদশ শতকে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলার

সাহিত্য-সংগীতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। শ্রীচৈতন্যদেব নিজে নৃত্য পরিবেশন করতেন এবং তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে নগরে নগরে 'নৃত্য সংকীর্তন' করতেন।[২৬] মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তিনটি শাখা– মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি ও অনুবাদ কাব্যে - সবগুলিই শাস্ত্রীয় সংগীতের পীঠস্থান ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়।

২) সংগীত শাস্ত্র: গৌড়ীয় নৃত্যের সংগীত শাস্ত্রের সংখ্যা একাধিক, যা অন্যান্য শাস্ত্রীয় নৃত্য থেকে এই নৃত্যশৈলীকে অনন্য করে তুলেছে। নৃত্যের মূল শাস্ত্রগ্রন্থ নাট্যশাস্ত্রের পাশাপাশি যে সকল শাস্ত্রগ্রন্থের নাম পাওয়া যায়– কবি জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* (১২শ সা.অব্দ), পণ্ডিত শুভঙ্কর লাহিড়ীর *শ্রীহস্তমুক্তাবলী* ও *সঙ্গীত দামোদর* (১৩শ-১৫শ সা.অব্দ), রূপগোস্বামীর *উজ্জ্বলনীলমণি*, *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* (১৫শ সা.অব্দ), কবি কর্ণপুরের *আনন্দবৃন্দাবন চম্পূ* (১৫শ সা.অব্দ), কবি শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজের *শ্রীগোবিন্দলীলামৃতম* (১৬শ সা.অব্দ), নরহরি চক্রবর্ত্তীর *শ্রীভক্তিরত্নাকর* (১৮শ সা.অব্দ) ইত্যাদি। বর্তমানে গৌড়ীয় নৃত্যের শিখন পদ্ধতিতে শুভঙ্কর লাহিড়ীর *শ্রীহস্তমুক্তাবলী* ও *সঙ্গীত দামোদর* অনুসরণ করা হয়। এই শাস্ত্রগুলোতে নৃত্যের প্রাথমিক শিখন বিষয়বস্তু যেমন– অভিনয়, ভাব-রস, তালাধ্যায়, নায়ক-নায়িকাভেদ, হস্তমুদ্রা ইত্যাদি বিদ্যমান।

৩) স্থাপত্য, ভাস্কর্য, লেখমালা ও চিত্রশিল্প: বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে রয়েছে–

চিত্র সূত্র নং জানাতি যস্ত সম্যক নরাধিপ।

প্রতিমালক্ষং বেত্তুং শক্যং তেন কহির্চিৎ।।[২৭]

অর্থাৎ, হে রাজা যে ব্যক্তি সম্যকভাবে চিত্রজ্ঞান জানেন না তিনি কোনো প্রকারেই প্রতিমা লক্ষণ জানতে সমর্থ হবেন না। আবার নৃত্য শাস্ত্র না জানলে চিত্রসূত্র বা চিত্র বিজ্ঞান আহরণ করা কঠিন। নৃত্যকলার সাথে চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে জানা যায়, তুর্কি অনুপ্রবেশের পূর্বে প্রাচীন বাংলায় প্রচুর কারুকার্য খচিত হর্ম্য, বারোতলার মন্দির, স্তূপ, বিহার ছিল।[২৮] এই স্থাপত্যগুলো আজ তেমন নেই বললেই চলে। তবু যেটুকু স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিলালিপি রয়ে গেছে প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য সেগুলোও কম নয়। পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতী, কান্তজিউ মন্দিরে নৃত্য ভাস্কর্যের সাথে নৃত্য পরিবেশনের স্থান, 'নাটমণ্ডপ' প্রাচীন ও মধ্যযুগের এই নিদর্শনগুলোতে দেখতে পাওয়া যায়। ভাস্কর্যের নৃত্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে গৌড়ীয় নৃত্যের কাঠামো গঠনে এর ব্যাপক ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত, পাল ও সেন যুগের নৃত্য ভাস্কর্যের মুদ্রার ব্যবহার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় নৃত্যে দেখতে পাওয়া যায়।

৪) গুরুমুখি লোকায়াত নৃত্যধারা: ইতিহাসের কালানুক্রমে বাংলায় ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সাথে সাথে তার প্রভাব সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে গভীরভাবে দাগ ফেলেছিল। এই সময়কালে পুথি, শাস্ত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প যখন প্রায় ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে, শিল্প-সাহিত্য যখন লুপ্তপ্রায়, তারই মধ্যে সুপ্তভাবে রয়ে গেছে গ্রামীণ পরিবেশের যত্নে মাখা সজীব লোকায়ত নৃত্যধারা। শিল্পের যেকোনো মাধ্যম শাস্ত্রীয়করণের পেছনে থাকে লোকশিল্প। লোকশিল্প থেকে ধ্রুপদিতে শিল্পের উত্তরণ ঘটে। বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যও তার ব্যতিক্রম

নয়। আজও বাংলার গ্রামীণ পরিবেশে চর্চিত হয়ে আসছে নাচনী, ছৌ, বাউল, কীর্তন, ঝুমুর, গম্ভীরা, জারি, সারি, কালীকাচ, ভাদু টুসু, মনসা-পালা, রায়বেঁশে ইত্যাদি ।

নাট্যশাস্ত্র-এর যুগ থেকে শুরু করে যুগ যুগ ধরে বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্য চর্চিত হয়ে এসেছে। কিন্তু এই পথপরিক্রমা নিরবচ্ছিন্নভাবে হয়নি। কখনো তুর্কি আক্রমণ, মুসলিম বিজয়, আবার কখনো ব্রিটিশদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে নৃত্যশিল্পীদের দেবদাসী থেকে স্বদাসীতে পরিণত হয়েছে। এছাড়া প্রান্তিক ভূমিশাসকদের যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষ, মহামারির কারণে বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যের পথ কখনোই মসৃণ ছিল না। কিন্তু এই পথশঙ্কুলতা পেরিয়ে সভ্য সমাজে সর্বপ্রথম নৃত্যের প্রশিক্ষণ শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মণিপুরী নৃত্যের (১৯২৬ সা.অব্দ) সিলেবাস তৈরি করে তার কাঠামোগত নৃত্য পদ্ধতি প্রচলনের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজে নৃত্যের স্থান প্রতিষ্ঠা করেন।[২৯] এর ফলে রবীন্দ্র সংগীতের সাথে এই নৃত্যে ও অন্যান্য দেশি বিদেশি নৃত্যের সম্মিলিতরূপ 'রবীন্দ্র নৃত্য' নামে পরিচিতি লাভ করে। এর কিছু সময় পর আরেক বাঙালি নৃত্যশিল্পী উদয়শংকর পাশ্চাত্য প্রভাবিত নৃত্যের নব্যধারা প্রবর্তন করেন। ধীরে ধীরে বাংলায় শহরকেন্দ্রিক গুণী নৃত্যশিল্পীর আবির্ভাব ও তাঁদের পথ অনুসারী তৈরি হয়। তবুও বাংলার নানা অঞ্চলে বিশেষত পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ সমাজে শাস্ত্রীয় নৃত্যের অনেক উপাদান লোকাচার, আচার-অনুষ্ঠান ও প্রাত্যহিক জীবনে টিকে ছিল, যা শহুরে সংস্কৃতির কাছে অপরিচিত ছিল। কিন্তু ব্রিটিশদের চলে যাবার পরও এই বাংলা অঞ্চলের মানুষ তার নিজস্ব শাস্ত্রীয় নৃত্যের অনুপস্থিতি অনুভব করেনি। অথচ প্রাচীন বাংলার সমৃদ্ধশালী নৃত্যের ইতিহাস অযতনে ঢাকা পড়েছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে। বিংশ শতকের শেষভাগে মহুয়া মুখোপাধ্যায়ের নিবিড় অনুসন্ধান, সংগ্রহ, পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাচীন বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যের অনুপস্থিত উপাদানগুলো নতুন করে গুরুত্ব পেতে শুরু করে। বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে নৃত্যের যোগসূত্র স্থাপন করে দেখা যায় যে, নৃত্যের বহু শাস্ত্রীয় উপাদান এ অঞ্চলের সামাজিক জীবনে প্রোথিত ছিল। বাংলা অঞ্চলের মানুষদের নিজস্ব শাস্ত্রীয় রূপ ধীরে ধীরে নতুন রূপে ফিরে পেতে শুরু করে। সর্বোপরি, ১৯৯৪ সা. অব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর ভারতের কলকাতাস্থ লেক কালীবাড়িতে অবস্থিত 'School Of Historical and Cultural Studies' এর এক প্রবন্ধ পাঠ সভায় মহুয়া মুখোপাধ্যায় তাঁর গবেষণা কর্ম বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্য 'গৌড়ীয় নৃত্য' নিয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই সভায় ব্রতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে রণবীর চক্রবর্ত্তী, অমিতাভ ভট্টাচার্য, সুজিত সেনের মতো বিদ্বৎ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এর আগের বছর ১৯৯৩ সা. অব্দের ১০ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত মাদ্রাজে এক ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে মহুয়া মুখোপাধ্যায় প্রথমবারের মতো বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্য নিয়ে তাঁর গবেষণা কর্ম পাঠ করেন। কিন্তু তখনো এই নৃত্যের নামকরণ হয়ে ওঠেনি। ১৯৯৪ সালের ১০ই সেপ্টম্বর 'Historical and Cultural Studies' থেকে প্রবন্ধ প্রকাশের উদ্দেশ্যে ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শে বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যের নামকরণ করা হয় 'গৌড়ীয় নৃত্য'। 'গৌড়ীয় নৃত্যের' নাম নিয়ে পুনর্বার বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যের পথ চলা শুরু হলো।[৩০]

নৃত্য শাস্ত্রীয় উপকরণ: গৌড়ীয় নৃত্যের মূল শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে ভরতমুনির *নাট্যশাস্ত্র* (আনু প্রাক সা.অব্দ ২য় শতক - সা.অব্দ ২য় শতক), পণ্ডিত শুভঙ্কর লাহিড়ীর *সঙ্গীত দামোদর*

ও *শ্রীহস্তমুক্তাবলী* (আনু. ১৫০০ সা.অব্দ) উল্লেখযোগ্য। এই আলোচনায় মূলত এই শাস্ত্রগ্রন্থত্রয় অনুসারে মূর্তিগুলোতে নৃত্য শাস্ত্রীয় উপকরণ অনুসন্ধান করা হলো।

নাট্যশাস্ত্র ও *সঙ্গীত দামোদর* মতে অভিনয় চার প্রকার। ১) আঙ্গিক অভিনয়– অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গ দ্বারা প্রকাশিত অভিনয়, ২) বাচিক অভিনয়– কথপোকথন সহযোগে অর্থাৎ পৌরাণিক আখ্যান, দেবীর স্তুতি ইত্যাদি দ্বারা প্রকাশিত অভিনয়। ৩) সাত্ত্বিক অভিনয়– সত্ত্বগুণ জাত মনের ভাব প্রকাশিত হয় যে অভিনয় দ্বারা। ৪) আহার্য অভিনয়– বাহ্যিক বিষয় অর্থাৎ বেশভূষা, অলংকার ইত্যাদি দ্বারা যে অভিনয়কে বোঝানো হয়।

আঙ্গিক অভিনয় অনুসারে উপাদানসমূহ:

১) হস্তভেদ: *শ্রীহস্তমুক্তাবলি* অনুযায়ী হস্তমুদ্রা তিন প্রকার। যথা– অসংযুক্ত হস্তমুদ্রা (৩০টি), সংযুক্ত হস্তমুদ্রা (২৪টি), নৃত্ত হস্তমুদ্রা (৩৩টি)।

২) স্থানক: বিভিন্ন ধরনের দাঁড়ানোর ভঙ্গিকে স্থানক বলে। *সঙ্গীত দামোদর* অনুযায়ী স্থানক ৩৩ প্রকার।

৩) ভঙ্গি: চিত্রসূত্র অনুসারে 'ভঙ্গি' ৪ প্রকার। যথা– সমভঙ্গ (সমপাদে সোজা দাঁড়ানো), আভঙ্গ (বক্ষ একটু হেলে পড়লে), ত্রিভঙ্গ (মস্তক, কটি, পদ তিনটি আলাদা আলাদা করে বক্র হলে), অতিভঙ্গ (মস্তক, বক্ষ, কটি, পদ– এই চারটি অঙ্গ অতিরিক্ত বক্র হলে)।

সাত্ত্বিক অভিনয় অনুসারে উপাদানসমূহ:

ভরতমুনি *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'রসবিকল্প' নামক অনুচ্ছেদে রসতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। পণ্ডিতের মতে, সহৃদয় দর্শকগণ নানা ভাবের-বাচিক, আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়ে স্থায়িভাবসমূহ আস্বাদন করেন ও আনন্দাদি উপভোগ করেন। এর থেকে নাট্যরস ব্যাখ্যাত হয়। শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত এই আটটি নাট্যরস বলে কথিত। পরবর্তীকালে অলংকারশাস্ত্রে শান্তরস বলে নবম রস যুক্ত হয়। বৈষ্ণবশাস্ত্রকারগণ এই নয়টি রসের বাইরে বিবিধ রস নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, তার মধ্যে মূল হল ভক্তিরস। ভক্তিরস আবার দু'প্রকার- মুখ্যভক্তিরস ও গৌণভক্তিরস। রূপগোস্বামির *উজ্জ্বলনীমণি* এবং *শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে পাওয়া যায়- মুখ্য ভক্তিরস পাঁচ প্রকার- শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। গৌণভক্তিরস সাত প্রকার- হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস।[৩১]

আহার্য্য অভিনয় অনুসারে উপাদানসমূহ:

নাট্যশাস্ত্র অনুসারে আহার্য অভিনয় চার প্রকার। ১) পুস্ত: মঞ্চসজ্জা, প্রেক্ষাপট, সজ্জিতকরণ ইত্যাদি। ২) অঙ্গরচনা: মুখে রঙ অর্থাৎ প্রসাধনের ব্যবহার, কেশবিন্যাস ইত্যাদি। ৩) অলংকরণ: অঙ্গজুড়ে অলংকারের ব্যবহার। এটি বিশেষত ভাস্কর্যে দেখা যায়। ৪) সঞ্জীব: জীবিত প্রাণী বা পশুর মঞ্চে উপস্থিতি।

বাচিক অভিনয় অনুসারে উপাদানসমূহ:

নৃত্যভাস্কর্যের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নৃত্যশাস্ত্র অনুসারে বাচিক অভিনয়ে ব্যবহার তেমন দেখা যায় না। তবে নৃত্যভাস্কর্যের ক্ষেত্রে বাচিক অভিনয় হিসেবে যা পাওয়া যায় সেগুলো হলো শিলালেখ, পৌরাণিক আখ্যান, তাম্রলেখ প্রভৃতি।

শাস্ত্রীয় নৃত্যের আঙ্গিকে শ্রী শ্রী সারঙ্গধর জিউ আখড়ার 'নর্তেশ্বরের' নৃত্য বিশ্লেষণঃ

শ্রী শ্রী সারঙ্গধর জিউ আখড়ায় প্রাপ্ত 'নর্তেশ্বর' মূর্তি ভাস্কর্য বিশ্লেষণে আমরা নিচের চিত্রগুলো আলাদা করে আলোচনা করতে পারি যেখানে–

চিত্র নং-৬, উর্ণনাভ অথবা প্রসারিত বৃদ্ধাঙ্গুল কমণ্ডলু ধৃত, কঙ্কণ পরিহিত। চিত্র নং-৭, মুষ্টি হস্তে ত্রিশূল ধৃত, কঙ্কণ পরিহিত। চিত্র নং-৮, কৃষ্ণসার হস্তমুদ্রায় কপাল ধৃত, মণিবন্ধে বলয় পরিহিত। চিত্র নং-৯, কাঙ্গুল হস্তমুদ্রায় রুদ্রাক্ষের জপমালা ধৃত, বলয় পরিহিত। চিত্র নং-১০, সম্ভবত কপিত্থ হস্তমুদ্রায় ডমরু ধরে আছে। তবে ভেঙে যাওয়ায় বস্তুটি বোঝা যাচ্ছে না। বলয় পরিহিত। চিত্র নং-১১, সন্দংশ হস্তমুদ্রা দিয়ে বর প্রদান করা বোঝানো হয়েছে। বলয়া পরিহিত। চিত্র নং-১২, তন্ত্রী হস্তমুদ্রা দিয়ে বীণা ধরে আছে। চিত্র নং-১৩, এই চিত্রে, মাথার ঠিক ওপরে কর্কট সংযুক্ত হস্তমুদ্রা দিয়ে সময় বা মহাকালকে বোঝানো হচ্ছে এবং বাকি দুই হাতে 'নাগালোক' ধরে আছে। কর্ণে অবতংশ বা কেয়র, মাথার জটায় কিরীট বা মুকুট, গলায় বিলম্বিত হার। বাহুতে নানা ধরনের অলংকারে শোভিত। এখানে ত্রিনয়নসমেত সৌম্য আয়তনেত্রে শান্ত রস দেখা যাচ্ছে। চিত্র নং-১৪, গণেশ চতুর্হস্তে বসে আছে দার্দুর স্থানকে। চিত্র নং-১৫, ডান হাতের ওপর যেখানে সাপের মাথা ধরে আছে সেখানে, গঙ্গা বসে আছেন। গঙ্গার হস্তমুদ্রা অঞ্জলি হস্ত ও খণ্ডসূচি স্থানকে রয়েছে। চিত্র নং-১৬, বিষ্ণু বসে আছেন পদ্মাসনে। চতুর্হস্তের এই মূর্তিটিতে দুই হাত শঙ্খ ও চক্র ধরে আছে এবং বাকি দুই হাত দিয়ে ভূমিস্পর্শ ধ্যান মুদ্রা ধরে আছে। চিত্র নং-১৭, এই মূর্তিটি নন্দীষাঁড়ের একটি রূপ। মাথাটি শিবলিঙ্গ বোঝাচ্ছে। বিশেষত এই মূর্তি সম্পর্কে অ্যানা স্লাকজার পর্যবেক্ষণ, এই মূর্তিটি শিবের মিলিত শক্তির রূপ প্রকাশ করেছে।[৩২] চিত্র নং-১৮, স্কন্দ এক হাতে ভূমি স্পর্শ ও অন্য হাতে ত্রিশূল ধরে আছে। এই মূর্তিটি কমলাসনে অধিষ্ঠিত। চিত্র নং-১৯, ব্রহ্মা কমলাসনের স্থানকে অধিষ্ঠান করে আছে। চতুর্হস্তের দুহাতের আয়ুধ স্পষ্ট নয় তবে ধারণা করে নেওয়া যেতে পারে, একহাতে ধনুক ও অন্য হাতে বেদ ধারণ করে আছে, আর বাকি দুহাত দিয়ে ধ্যান মুদ্রা ধরে আছে। চিত্র নং-২০ ও ২১, এই শিলাপ্রস্তরের ওপরের দু'ধারে দুজন 'বিদ্যাধর' রয়েছে। এদের হাতে পুষ্পমালা এবং উভয়ের স্থানক পৃষ্ঠোত্তান। চিত্র নং-২২ ও ২৩, শিলাপ্রস্তরের একেবারে ডানদিকে গঙ্গা হাতে চামর ও কমণ্ডলু হাতে 'আভঙ্গ' ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে মকরের ওপর। অন্যদিকে বামে লক্ষ্মী 'আভঙ্গ' ভঙ্গিমায় দর্পণ হাতে, বাহন সিংহের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। গঙ্গার ঠিক উপরে চামুণ্ডা কুঞ্চিত অর্ধমণ্ডল স্থানকে দাঁড়িয়ে আছে। চিত্র নং-২৪, নন্দী ষাঁড়ের ওপর নৃত্যরত শিবের স্থানক হল অর্ধমণ্ডলী এবং পাদভেদ কুঞ্চিত। পায়ে অলংকার রয়েছে তুলাকুটি। চিত্র নং-২৫, নৃত্যরত গণেরা আনদ্ধ বাদ্য- ঢাক ও ঘনবাদ্য- ঝাঁঝর হাতে, অতিভঙ্গিতে, অর্ধমণ্ডল স্থানকে দাঁড়িয়ে আছে। এখানেও নৃত্যরত গণেরা আনদ্ধ বাদ্য ঢাক বাজাচ্ছে একজন ও অন্যজনের বাম হাত গজহস্ত ও

ডানহাত কাঁধের ওপর খটকামুখ হস্ত রেখে অতিভঙ্গিতে অর্ধমণ্ডলী স্থানকে দাঁড়িয়ে আছে। এ ধরনের হস্তমুদ্রাকে নৃত্যহস্ত বলা হয়ে থাকে।

উপসংহার

এতদ বাংলা অঞ্চলে শিবের অধিষ্ঠিত মূর্তি নর্তেশ্বর এবং এই মূর্তিতে নৃত্যের শাস্ত্রীয় উপকরণ সন্ধান এই গবেষণাপত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুপ্রাচীনকাল থেকে এ অঞ্চলের মানুষের পূজার মাধ্যম হিসাবে নর্তেশ্বর মূর্তি ব্যবহৃত হয়েছে। সম্পূর্ণ অনালোচিত তেমন এক নর্তেশ্বর মূর্তি, যা শ্রী শ্রী সারঙ্গধর জিউ আখড়ায় প্রাপ্ত, প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চলের শাস্ত্রীয় নাচ হিসেবে গৌড়ীয় নৃত্যকে একটি স্থায়ী পরিচয় প্রদান করে। এই প্রবন্ধে উপরোল্লিখিত নর্তেশ্বর মূর্তিকে কেন্দ্র করে গৌড়ীয় নৃত্যের শাস্ত্রীয় উপকরণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণ বিচারে যে বিষয়গুলো প্রতিভাত হলো সেগুলো হলো-

- অঞ্চলভিত্তিক বিচারে গাঙ্গেয় এলাকার ভাস্কর্যের রীতি 'বঙ্গ রীতি' বলে প্রাধান্য পেয়েছে।
- এই বঙ্গ রীতির 'নর্তেশ্বর' ভাস্কর্যটি মৎস্যপুরাণাশ্রয়ী। অর্থাৎ, শাস্ত্র মেনে এই ভাস্কর্যটি নির্মিত হয়েছে।
- প্রাচীনত্বের বিচারে এই মূর্তিটি পাল-সেন যুগের শিল্পকে প্রতিনিধিত্ব করে।
- গঠনশৈলী বিবেচনা করে দক্ষিণ ভারতের 'নটরাজের' মূর্তি অপেক্ষা বাংলার 'নর্তেশ্বর' মূর্তিটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নৃত্যের দেবতা রূপে প্রতীয়মান হয়।
- শ্রী শ্রী জিউ আখড়ার 'নর্তেশ্বর' মূর্তির প্রাচীনত্ব বিচারে বাকি তিনটি নর্তেশ্বরের আলোচনা করা হয়েছে। তার সাপেক্ষে 'নর্তেশ্বর' পাল-সেন যুগের গঠনশৈলী বলেই বিবেচিত হয়। খুব অল্প সংখ্যক পার্থক্য ছাড়া মোটামুটিভাবে এদের সকলেরই সাদৃশ্য রয়েছে।
- গৌড়ীয় নৃত্যের শাস্ত্রগ্রন্থ অনুসারে এই মূর্তির হস্ত, পদ, ভঙ্গি, স্থানক, রস বিচার করা হয়েছে। এতে নাট্যশাস্ত্র, সঙ্গীত দামোদর ও শ্রীহস্তমুক্তাবলীর শাস্ত্রীয় উপাদান স্পষ্টভাবে রয়েছে। যেমন– ভট্টশালী বারো হাতের 'নর্তেশ্বরের' জটার ওপরের দুহাতের মুদ্রাকে 'অঞ্জলি' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু, এই যুক্তি খণ্ডন করে আন্না গ্লাকজা বলেছেন শাস্ত্রে বর্ণিত অঞ্জলি হস্তের বিবরণীর সাথে প্রাপ্ত নর্তেশ্বরের মিল নেই। বরং, সঙ্গীত দামোদর ও শ্রীহস্তমুক্তাবলী অনুযায়ী উল্লিখিত হস্তমুদ্রা সংযুক্ত হস্তমুদ্রার 'কর্কটের' সাথে সম্পূর্ণরূপে মিলে যায়।
- দক্ষিণ ভারতের 'নটরাজ' এর মতো বাংলার 'নর্তেশ্বর' বিশ্বের গুণগ্রাহীদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ অত্যন্ত প্রয়োজন।
- শ্রী শ্রী সারঙ্গধর জিউ আখড়ার 'নর্তেশ্বরে' গৌড়ীয় নৃত্যের শাস্ত্রীয় উপাদান বিদ্যমান। নৃত্যগবেষকদের জন্য এই নর্তেশ্বরের মূর্তিটি শিক্ষণীয়।
- শ্রী শ্রী সারঙ্গধর জিউ আখড়া বিগ্রহ মন্দিরের অতিসত্বর সংস্কার প্রয়োজন এবং প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সাহায্যার্থে 'নর্তেশ্বর' মূর্তিটি সংরক্ষণের সুব্যবস্থা প্রয়োজন।
- সর্বোপরি, পুনরুদ্ধারকৃত নর্তেশ্বর মূর্তিতে বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্য 'গৌড়ীয় নৃত্যের' সকল শাস্ত্রীয় উপকরণ বিদ্যমান। এই নৃত্যধারার নবায়নে শ্রী শ্রী সারঙ্গধর জিউ আখড়ার 'নর্তেশ্বর' মূর্তিটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

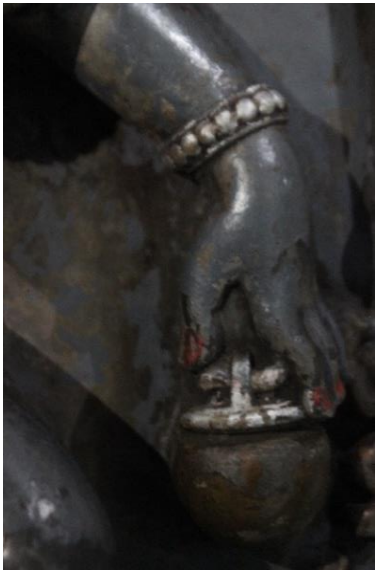

চিত্র-৬
ছবি - লেখক

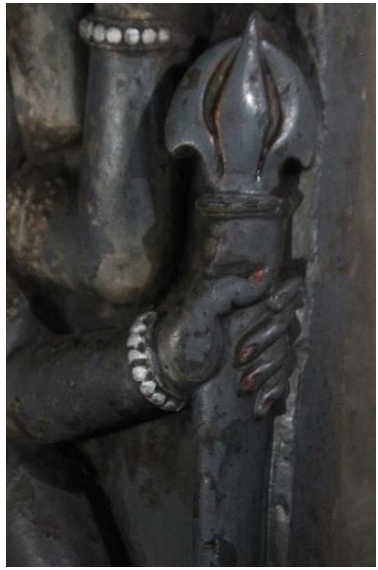

চিত্র-৭
ছবি - লেখক

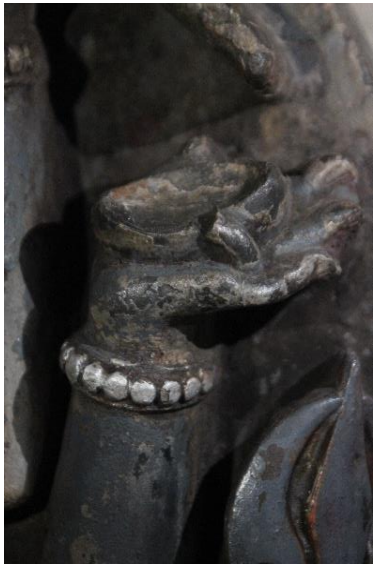

চিত্র-৮
ছবি - লেখক

চিত্র-৯
ছবি - লেখক

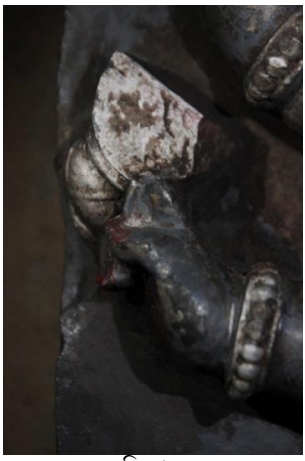

চিত্র-১০
ছবি - লেখক

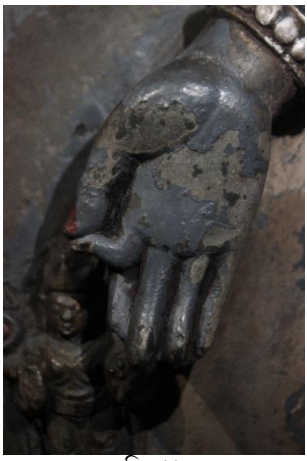

চিত্র-১১
ছবি - লেখক

চিত্র-১২
ছবি - লেখক

চিত্র-১৩
ছবি - লেখক

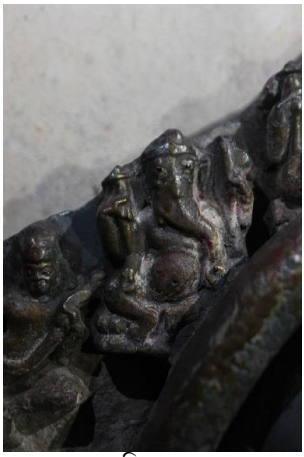

চিত্র-১৪
ছবি - লেখক

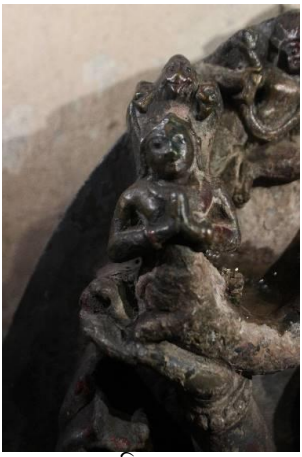

চিত্র-১৫
ছবি - লেখক

চিত্র-১৬
ছবি - লেখক

চিত্র-১৭
ছবি - লেখক

চিত্র-১৮
ছবি - লেখক

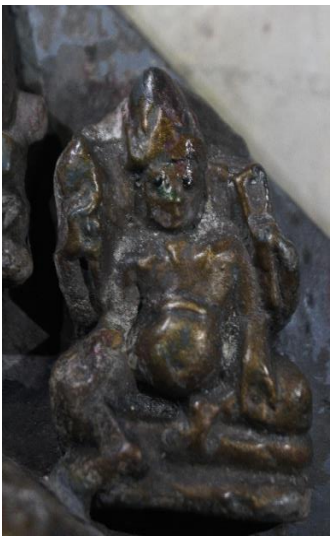

চিত্র-১৯
ছবি - লেখক

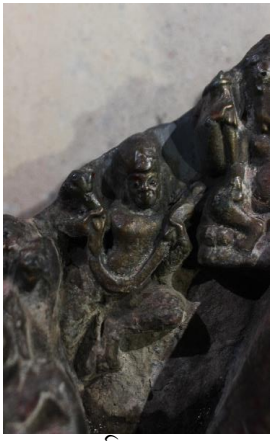

চিত্র-২০
ছবি - লেখক

চিত্র-২১
ছবি - লেখক

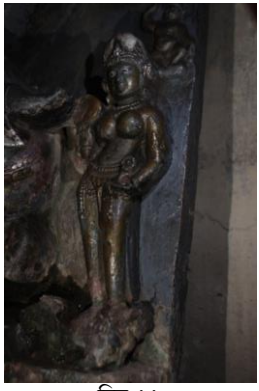

চিত্র-২২
ছবি - লেখক

চিত্র-২৩
ছবি - লেখক

চিত্র-২৪
ছবি - লেখক

চিত্র-২৫
ছবি - লেখক

তথ্যসূত্র

১ সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্তী, *নাট্যশাস্ত্র*, *খণ্ড-১*, (কলকাতা: নবপত্র, ১৯৮২), ৮৮-৮৯।

২ Sharada Srinivasan, "Shiva as 'Cosmic Dancer': On Pallava Origins for the Nataraja Bronze," *The Archaeology of Hinduism, Vol. 36,* (Sep. 2004), 432.

৩ কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, *বাংলার ভাস্কর্য*, (কলকাতা: সুবর্ণরেখা, ১৯৮৬), ৯।

৪ Sudipa Ray Bandopadhyay, *Nataraja Images of Bengal,* (Kolkata: University of Calcutta, 2017), xi.

৫ Anna A. Ślączka, "Lost and Found? A Note on Two Images of Dancing Śiva from Bangladesh", *Journal of Bengal Art, Vol. 25,* (2020), 27-35.

৬ Anna A. Ślączka, *Dancing Siva Images from Bengal: Studies in South Asian Heritage,* (Dhaka: Bangla Academy, 2015), 125.

৭ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্তী, *নাট্যশাস্ত্র*, *খণ্ড-২*, (কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২), ১১৮।

৮ অশোক কে. ভট্টাচার্য, ভাস্কর্য", *বাংলাদেশের ইতিহাস, আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতে আদি বাংলা (আনু. ১২০০ সা. অব্দ পর্যন্ত)*, *খণ্ড-২*, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১৯), ৩২৭-৩৩৬।

৯ Lama Chimpa & Alaka Chattopadhyaya, *Tāranātha's History of Buddhism in India,* (Delhi: Matilal Banarsidass, 1990), 348.

১০ জিনাহ্ কিম, "বাংলার ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ ভাস্কর্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস, আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতে আদি বাংলা (আনু. ১২০০ সা. অব্দ পর্যন্ত)*, *খণ্ড-২*, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১৯), ৩৬৩।

১১ Ananda Coomaraswamy, *The Dance of Siva: Fourteen Indian Essays,* (New York: The Sunwise Turn, Inc., 1918), 56.

১২ Sharada Srinivasan, "Shiva as 'Cosmic Dancer': On Pallava Origins for the Nataraja Bronze", 433.

১৩ Shiva Nataraja, A Study in Myth, Iconography, and the Meaning of a Sacred Symbol, Richard Stromer, PhD, https://www.soulmyths.com/shivanataraja.pdf/ accessed on 14th November 2025.

১৪ Nalini Kanta Bhattasali, *Brahmanical Sculptures: Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum,* (Dhaka: Bangladesh National Museum, 1929), 110-111.

১৫ Ślączka, *Dancing Siva Images from Bengal: Studies in South Asian Heritage,* 125.

১৬ মহুয়া মুখোপাধ্যায়, *গৌড়ীয় নৃত্য প্রাচীন বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্য*, (কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪), ১৯৭।

১৭ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, *মৎস্যপুরাণম*, (কলকাতা: বঙ্গবাসী, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ), ৮৯৬-৮৯৭।

১৮ Enamul Haque, *Bengal Sculptures Hindu Iconography up to C. 1250 A.D.* (Dhaka: Bangladesh National Museum, 1992), 148-149.

১৯ R R Nagaswami, Crispin Branfoot, Public Interview, *http://sahapedia.org/the-great-chola-temples*/ accessed 2025.
২০ Bhattasali, *Brahmanical Sculptures: Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum*, 114.
২১ Tarun Sarkar, A Journey to the Past with Dancing Shiva, The Daily Star, Sept 27, 2019, https://www.thedailystar.net/frontpage/news/journey-the-past-dancing-shiva-1805938 accessed on 12th October 2025.
২২ শ্রী জগদীশ আচারিয়া, এগনেস র‍্যাচেল প্যারিস, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ৩১ আগস্ট ২০২৫।
২৩ মহুয়া মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, ১।
২৪ মহুয়া মুখোপাধ্যায়, *গৌড়ীয় নৃত্যের উৎস সন্ধানে*, (কলকাতা: সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ, ২০০৮), ১।
২৫ আশা দাস ও আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*, (কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬৯), ৩৫।
২৬ মুখোপাধ্যায়, *গৌড়ীয় নৃত্য প্রাচীন বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্য*, ৩৪।
২৭ Priyabala Shah, *Vishnudharmottara- Purana*, 3rd khanda, vol. II, (Boroda Oriental Institute, 1961), 3-4.
২৮ মহুয়া মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, ২০।
২৯ মহুয়া মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, ১৩।
৩০ মহুয়া মুখোপাধ্যায়, সাক্ষাৎকার, ১৩ নভেম্বর ২০২৫।
৩১ মহুয়া মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, ৯৯।
৩২ Anna Ślączka, Ibid, 31.